এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েয। কিন্তু সহীহ্ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহ্বিদগণের মতভেদ রয়েছে ঃ সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে; কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েয মনে করেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েয বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশংকা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েয নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল---এই তিন জন প্রথম মযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই অনুমতি দেন নি---অনর্থের আশংকা হোক বা না হোক। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) অনর্থের আশংকা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহ্বিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশংকায় নিষেধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

اعلم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر اليه فحل النظر منوط لعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك فى الشهوة ولا عورة ـ

কোন অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয হয়ে যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোন শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার আশংকা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়।---(ফতহুল কাদীর)

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশংকার তফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কাম-প্রবৃত্তি থাকা জরুরী নয়, বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না---এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরোক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশংকা থেকে মুক্ত আছে?

শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন ঃ

وهذا كله اذا لم يكن النظر عن شهوة فان كان يعلم انه ان نظر اشتهى لم يحل له النظر الى شيئ منها

মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন---যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।---(মবসূত)

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লেখেন ঃ

فان خاف الشهوة او شك امتنع النظر الى وجهها فحل النظر مقيدة بعدم الشهوة والا فحرام وهذا فى زمانهم واما فى زماننا فمنع من الشابة الا النظر لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد وايضا قال فى شروط الصلوة وتمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة -

যদি কামভাবের আশংকা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোন পর্যায়ে দৃষ্টি-পাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাযের শর্তাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশংকার কারণে।

এই আলোচনা ও ফিকাহ্‌বিদগণের মতভেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন—বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরীয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোন ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাযের কসর ও রোযার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে—বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশংকা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েয হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে—এক. নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া—প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাস'আলা ঃ পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলীতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহ্‌রাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

(৫৬) আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পয়গম্বর (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং খুব সালাম প্রেরণ কর (যাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লিখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নিগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তাঁর সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (সা)-এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মু'মিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। 'ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মু'মিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরীয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের

হিফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।---পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 'মাকামে-মাহমূদা' বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহ্র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা-কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় 'ওমূমে মুশতারিক' বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই এ স্থলে 'সালাত' শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

'সালাম' শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। 'আসসালামু আলায়কা' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা على অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে على অব্যয় যোগে عليك অথবা عليكم বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে 'সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্র সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব 'আসসালামু আলায়কুম' বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ আপনার হিফাযত ও দেখাশোনার যিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি ঃ হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রা) বলেন ঃ (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে السلام عليك ايها النبى বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন ঃ দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল—— اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি; বরং স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাযে এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতিপালিত ও দরূদের সওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাস'আলা ঃ নামাযের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাযের বাইরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হত। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওযার সামনে সালাম আরয করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ——হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য ঃ দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব

মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরী করা হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

দরূদ ও সালামের বিধানাবলী ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাস'আলা ঃ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ رغم انف رجل ذكرت عند ه فلم يصل على অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ البخيل من ذكرت عند ه فلم يصل على ---সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

০ একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মুস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে---তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেন নি।

০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সা' লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

০ দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্য যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে তাতে কোন গোনাহ্‌ নেই। ইমাম নববী একে মকরূহ্‌ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মকরূহ্‌ তানযিহী। আলিমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন।

০ পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলিমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন ঃ

لا يصلى على احد الا على النبى صلى الله عليه وسلم لكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار

ইমাম শাফেয়ী বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মকরূহ্। ইমাম আযমের মযহাবও তাই। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মু'মিনগণকে শরীক করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় السلام عليكم বলা জায়েয ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলায়হিস্ সালাম বলা জায়েয নয়।—(খাসায়েসে-কুবরা)

কাজী আয়ায বলেন, অনুসন্ধানী আলিমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য—অপরের জন্য জায়েয নয়; যেমন সোবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে رضى الله عنهم ورضوا عنه বলা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

(৫৭) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (৫৮) যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-কে (ইচ্ছাপূর্বক) কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (এমনিভাবে) যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কোন (শাস্তিযোগ্য) অপরাধ করা ব্যতীতই কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা (নিজেদের পিঠে) বহন করে (অর্থাৎ কথার মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা মিথ্যা অপবাদ এবং কর্মের মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা প্রকাশ্য পাপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হত; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুঁশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে 'ইচ্ছা-পূর্বক' শব্দটি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নিগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু কাফিররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌঁছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ্ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রসূলের কষ্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রসূলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্টই যে আল্লাহ্ তা'আলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রা)-র নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذ -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্টের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের দিন-গুলোতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন ঃ লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। ---(মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সফিয়্যা (রা)-র সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-র বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে-কিরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী ঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও।---(মাযহারী)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম—যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমান-দের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও আশংকা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরীয়তের আইনে জায়েয। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ ও রসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম ঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়ত-সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و المؤمن امنه الناس على دمائهم و اموالهم -

কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট পায় না। কেবল সে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে।---(মাযহারী)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ
فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾
مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ
خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

(৫৯) হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৬০) মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে সেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীগণকেও বলুন, তারা যেন তাদের (মুখমণ্ডলের) উপরে তাদের চাদরের কিয়দংশ টেনে নেয়। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তারা যেন চাদর দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করে নেয়। সূরা নূরের শেষভাগে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ আয়াতে এর তফসীর রেওয়ায়েত দ্বারা করা হয়েছে। দাসীদের জন্য মাথা আদতে সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মুখমণ্ডল খোলার ব্যাপারে তারা স্বাধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাপ্তা। এর কারণ এই যে, তারা প্রভুর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকে। তাই কাজকর্মের জন্য তাদের বাইরে যাওয়ার এবং মুখমণ্ডল খোলার প্রয়োজন বেশি। সুতরাং নারীরা এরূপ বাইরে যেতে বাধ্য নয়। দুষ্ট লোকেরা স্বাধীন নারীদেরকে

তাদের পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উত্যক্ত করার সাহস করত না। তারা কেবল দাসীদেরকেই উত্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ভ্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করা হত। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও নবী-পত্নী, কন্যা ও সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদরে আবৃত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাথার কিছু নিচে মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে নেবে; যাকে ঘোমটা দেওয়া বলা হয়। এই আদেশের কারণে শরীয়তসম্মত পর্দার আদেশও পালিত হয়ে যাবে এবং খুব সহজে দুষ্ট লোকদের কবল থেকে হিফাযতও হয়ে যাবে। অতপর দাসীদের হিফাযতের ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এই মুখমণ্ডল ও মস্তক আবৃত করার ব্যাপারে কোন কম বেশি অথবা অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা হয়ে গেলে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি ক্ষমা করে দেবেন। অতপর যারা দাসীদেরকে উত্যক্ত করত, তাদেরকে এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুজব রটনা করত, তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ মুনাফিকদের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে (প্রবৃত্তি পূজার) রোগ আছে (ফলে তারা দাসীদেরকে উত্যক্ত করে) এবং (তাদেরই মধ্য থেকে) যারা মদীনায় (মিথ্যা ও অস্বস্তিকর) গুজব রটনা করে, তারা যদি (এসব কুকর্ম থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই (কোন না কোন দিন) আমি আপনাকে তাদের উপর চড়াও করে দেব (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়ে দেব।) অতঃপর (এই আদেশের পর তারা আপনার কাছে খুব কমই থাকতে পারবে, তাও চতুর্দিক থেকে) লাঞ্ছিত হয়ে (অর্থাৎ মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে সামান্য সময় দেওয়া হবে, তাতেই তারা এখানে থাকতে পারবে। এ সময়ের মধ্যেও চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছিত হবে। এরপর বহিষ্কৃত হবে। বহিষ্কারের পরও তারা কোথাও শান্তি পাবে না। বরং) যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (কারণ এই যে, বহিষ্কারই ছিল তাদের কুফরের দাবি। কিন্তু কপটতার আড়ালে তারা আশ্রয় পেয়েছে। যখন প্রকাশ্যে এরূপ বিরোধিতা শুরু করবে, তখন আড়ালও বাকি থাকবে না। ফলে তাদের সাথেও কুফরের আসল দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ তাদের বহিষ্কার, বন্দী, হত্যা সবই বৈধ হবে। বের হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হলে সে সময়েই তারা নিরাপদ থাকবে। এরপর যেখানে যাবে, সেখানেই চুক্তি না থাকার কারণে তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার অনুমতি থাকবে। মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত এই হুমকির মাধ্যমে দাসীদেরকে উত্যক্ত করার বিষয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং গুজব ছড়ানোর পথও বন্ধ করা হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হলে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটতায় লিপ্ত থাকে। অন্যথায় সাধারণ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে যাবে। বিপর্যয় সৃষ্টি ও চক্রান্তের এই শাস্তি কেবল তাদেরকেই নয়; বরং) পূর্বে যারা অর্থাৎ (দুষ্কৃতিকারী) অতীত

হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র এই বিধান ছিল। (তাদেরকে নৈসর্গিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে; অথবা পয়গম্বরগণের হাতে জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। এরূপ ঘটনা ঘটে না থাকলে এ ধরনের শাস্তিকে অবান্তর মনে করা সম্ভবপর ছিল। এখন তো অবান্তর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে (কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে) পরিবর্তন পাবেন না (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান জারি করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। سنة الله শব্দে প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে না এবং ولن تجد لسنة الله تبديلا বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সা)-কে পীড়া দেওয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেতেন।

দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণত এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফিকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে ইচ্ছাপূর্বক উত্ত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজনবশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বারবার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে

গেলেও বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতপর মুনাফিকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন।

উল্লিখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছে: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ এতে يدنين শব্দটি ادناء থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন: এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়।—(ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:

امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة۔

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পত্নীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন: আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (র)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে جلباب ও ادناء এর তফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন।

মস্তকের উপর দিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে عليهن শব্দের তফসীর—অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপর দিক থেকে লটকানো।

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো আবৃত করা জরুরী। শুধুমাত্র অপারকতা এই হুকুম বহির্ভূত।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্ত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা-আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

উপরোক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাযম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের তফসীর অধিকাংশ আলিমের তফসীর থেকে ভিন্নরূপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তফসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদীদের হিফাযতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি হত্যা ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا —অর্থাৎ ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফিরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফিরদের জন্য শরীয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত যিম্মী হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইয্যত-আবরুর হিফাযত করা মুসলমানদের অনুরূপ ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি এটাও না মানে এবং যুদ্ধ করতেই উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপস নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামা কাযযাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের ঐকমত্যে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট সাক্ষী। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শাস্তিকে সাধারণ কাফিরদের শাস্তির কাতারে আনার জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল ঃ

(১) নারীরা প্রয়োজন বশত গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব ছড়ানো হারাম।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي
النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ
اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

(৬৩) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই।

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলটপালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অবিশ্বাসী) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে (অবিশ্বাসীসুলভ) প্রশ্ন করে (যে, কখন হবে?) আপনি (জওয়াবে) বলুন, এর (সময়ের) জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই, আর আপনি কি করে জানবেন (যে, কখন হবে, তবে সংক্ষেপে তাদের জেনে রাখা উচিত) সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই। (কারণ, সময় যখন নির্দিষ্ট নেই; তখন নিকটপরিণামকে ভয় করা, এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অবিশ্বাসীসুলভ জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

কিয়ামতকে আসন্ন বলার এক কারণ এটাও সম্ভবপর যে, কিয়ামত প্রত্যহ নিকটবর্তী হচ্ছে। যে বস্তু ক্রমশই সামনে থেকে আসছে, তাকে আসন্ন মনে করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও কঠোরতা দৃষ্টে সারা বিশ্বের আয়ুষ্কালও সামান্য প্রতীয়মান হবে। হাজারো বছরের এই মেয়াদ কয়েকদিনের সমান অনুভূত হবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন, তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে, (অর্থাৎ মুখমণ্ডল অগ্নিতে ছেঁচড়ানো হবে— একবার এ পার্শ্ব ও একবার ওপার্শ্ব।) তখন তারা (আক্ষেপ করে) বলবে, হায়! আমরা যদি (দুনিয়াতে) আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম! (তবে আজ এ বিপদে পতিত হতাম না। আক্ষেপের সাথে সাথে পথভ্রষ্টকারীদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতাদের (অর্থাৎ শাসকবর্গের) ও বড়দের (অর্থাৎ যাদের কথা মান্য করা অন্য কোন কারণে আমাদের জন্য জরুরী ছিল) কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদেরকে (সরল পথ থেকে) পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ-শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহা অভিসম্পাত করুন। (এটা সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ— رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ -এর জওয়াব সেই আয়াতেই لِكُلٍّ ضِعْفٌ বলে দেওয়া হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদল স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপছলে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

(৬৯) হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। (৭০) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ-সমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা (কিছু অপবাদ রটনা করে) মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, অতপর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। (অর্থাৎ তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি—অপবাদ আরোপকারীরাই মিথ্যুক ও দণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হয়েছে।) তিনি [অর্থাৎ মূসা (আ)] আল্লাহ্র কাছে খুব মর্যাদাবান (পয়গম্বর) ছিলেন। (তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পয়গম্বরগণের জন্যও এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্তি-দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে কষ্ট দিও না। কারণ, তাঁর বিরোধিতা প্রকারান্তরে আল্লাহ্রই বিরোধিতা। এই বিরোধিতার পরিণামে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাই প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করো। অতপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে ঃ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর। বিশেষত কথাবার্তায় এদিকে

খুব লক্ষ্য রাখ। যখন কথা বলতে হয়,) সঠিক কথা বল, যাতে সততার সীমা-লঙ্ঘিত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা (এর প্রতিদান) তোমাদের আমল কবুল করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, (কিছু আমলের বরকতে এবং কিছু তওবার বরকতে, যা আল্লাহ্ভীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আনুগত্যের ফল। আনুগত্য এমন বিষয় যে,) যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

মূসা (আ)-র সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্য জরুরী নয় যে, মুসমলমানরা এরূপ কোন কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কতক সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেন নি যে, কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ আশংকা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। মূসা (আ)-র কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন---হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা (আ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল---এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে---হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে মূসা (আ)-র নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা (আ) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না---যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে গেঁছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক মূসা (আ)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল

এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই মূসা (আ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। অতপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, মূসা (আ)-র আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এই আয়াতের তফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا—অর্থাৎ মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। আল্লাহ্র কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মূসা (আ) যে এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হারূন (আ)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।---(ইবনে কাসীর)

পয়গম্বরগণকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহ্র রীতি ঃ এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মূসা (আ) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে হাযির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোন পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা আল্লাহ্র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ

قول سديدا—اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم এর তফসীর কেউ কেউ সত্য কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে صادق – مستقيم ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سديد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। একারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قول سديد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায়ঃ এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ্‌ভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহ্‌ভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে; যেমন এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يصلح لكم اعمالكم এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্বঃ কোরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌ভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্‌ভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اتقوا الله আদেশের পর قولوا قولا سديدا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের

আয়াতে وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ আদেশের পর اتَّقُوا اللَّهَ বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্‌ভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্‌ভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ — এতে আল্লাহ্‌ভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহ্‌র ওলী। আরও এক আয়াতে اتَّقُوا اللَّهَ আদেশের সাথে وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহ্‌ভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয়ঃ হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলভী (র) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ্ সাহেবের অনুবাদ এই ঃ বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্যে তোমার কর্ম।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

(৭২) আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালিম অজ্ঞ। (৭৩) যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই আমানত (অর্থাৎ আমানতরূপী বিধানাবলী) আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সৃষ্টি করে, যা এখনও আছে—আমার বিধানাবলী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম। তাদের সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিলে তোমাদেরকে পুরস্কার ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানলে আযাব ও কষ্ট দেওয়া হবে। অতপর তাদেরকে এসব বিধান গ্রহণ করার ও গ্রহণ না করার এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলাম, তোমরা যদি এগুলো গ্রহণ না কর, তবে আদিষ্ট সাব্যস্ত হবে না এবং সওয়াব ও আযাবের যোগ্য হবে না। উপরন্তু তোমাদেরকে অবাধ্যও বলা হবে না। তাদের মধ্যে যতটুকু চেতনা ছিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়ার কারণে) অতপর তারা (শাস্তির ভয়হেতু পুরস্কারের সম্ভাবনা থেকেও হাত গুটিয়ে নিল এবং) তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং (এ দায়িত্বের ব্যাপারে) ভীত হল (যে, আল্লাহ্ জানেন এর পরিণাম কি হবে! তারা যদি এটা গ্রহণ করত, তবে মানুষের মত তাদেরকেও জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হত, যা বিধানাবলী, সওয়াব ও আযাব বোঝার জন্য জরুরী। তারা এটা গ্রহণ না করায় জ্ঞানবুদ্ধি দান করারও প্রয়োজন হয় নি। মোটকথা, তারা তো অস্বীকার করল) কিন্তু (যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার পর মানুষ সৃষ্টি করে তার সামনেও এ আমানত পেশ করা হল, তখন,) মানুষ (আল্লাহর জ্ঞানে তার প্রতিনিধিত্ব অবধারিত ছিল বিধায়) তা গ্রহণ করল। [সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যেও এতটুকুই প্রয়োজনীয় চেতনা বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবত অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ করা হয়েছিল ও আমানত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকার গ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধির সঞ্চার করা হয়ে থাকবে। এটা কোন বিশেষ মানুষ যথা আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অঙ্গীকার গ্রহণের অনুরূপ এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবুল করাও ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে। সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আদিষ্ট হল না এবং মানুষ আদিষ্ট হয়ে গেল। আয়াতে এ ঘটনা স্মরণ করানোর রহস্য সম্ভবত তাই, যা অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা স্মরণ করানোর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব বিধান পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। সুতরাং তা পালন করা

উচিত। জ্বিনজাতিও আদিষ্ট বিধায় সম্ভবত তারাও এই পেশ ও বহনের মধ্যে শরীক ছিল। কিন্তু এ স্থলে যেহেতু মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশেষ-ভাবে মানুষই উল্লেখিত হয়েছে। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর মানুষের আস্থা, সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক দিয়ে এই হল যে,] নিশ্চয় সে (অর্থাৎ মানুষ করণীয় বিষয়াদিতে) জালিম (এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে) অজ্ঞ (অর্থাৎ কর্ম ও বিশ্বাস উভয়ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ করে। এ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা। সমষ্টিগতভাবে এই দায়িত্বের) পরিণাম এই হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে (কারণ তারাই বিধানাবলী বিনষ্ট করে) শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি মনোনিবেশ (ও দয়া) করবেন। (বিরুদ্ধাচরণের পরও যদি কেউ বিরত হয়, তাকেও মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হবে। কেননা,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কি ঃ এস্থলে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবেয়ী প্রমুখ তফসীরবিদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে ; যেমন শরীয়তের ফরয কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাযত, ধনসম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে।---(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

الظاهر انها كل ما يؤتمن عليه من امر ونهى وشان ودين ودنيا والشرع كله امانة وهذا قول الجمهور

প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরীয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-

বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই—مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দু'টি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাযিল করা হয়েছে, অতপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মু'মিনরা কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। (অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু) তার চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোন অংশ নেই ..... মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। (আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,) মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোন বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই ঃ আমানতের হিফাযত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। (ইবনে-কাসীর)

আমানত কিরূপে পেশ করা হবে ঃ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই

এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল ?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কোরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে ঃ

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। إِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্‌র হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌কে চেনা এবং তাকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতন ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোন অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও

পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয়ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল? আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাযী হও অথবা গররাযী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবূল করা ও কবূল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হল, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর বাচনিক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আ)

জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যত বোঝা যায় যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(মাযহারী)

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا —ظلوم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি

কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহ্‌র আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে 'আশরাফুল মখলুকাত' আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আদম (আ) ও সমগ্র মানব জাতি---কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তফসীর-বিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে একই তফসীর বর্ণিত আছে।---(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন ظلوم ও جهول শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ—এখানে لام অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لام عاقبت বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী-দেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই لام এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে لدوا للموت وابنوا للخراب—অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ -এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে

আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে—এক. কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। দুই. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظلوم ও جهول শব্দদ্বয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের সমর্থন রয়েছে।

سورة السبا

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২) তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা (ও গুণকীর্তন) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক। (তিনি ইহকালে যেমন প্রশংসার হকদার, তেমনি) পরকালেও প্রশংসা (ও গুণকীর্তন) তাঁরই জন্য শোভনীয়। (এটা এভাবে প্রকাশ পাবে যে, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর এ ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

ইত্যাদি) তিনি প্রজ্ঞাময়, (আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টিকে অসংখ্য উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বলিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব উপযোগিতা ও উপকারিতা সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত। তিনি এমন খবরদার যে) তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে (যথা বৃষ্টির পানি) এবং যা তা থেকে নির্গত হয় (যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতাগণ আকাশে উঠানামা করেন, শরীয়তের বিধানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উত্থিত হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই যে, সব মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কৃতজ্ঞ হবে এবং কেউ ত্রুটি করলে সে শাস্তি পাবে। কিন্তু) তিনি (আল্লাহ্) পরম দয়ালু (এবং) ক্ষমাশীল (ও স্বীয় রহমতে সগীরা গোনাহ্ সৎকর্মের ফলে, কবীরা গোনাহ্ তওবার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাহ্ কেবল স্বীয় কৃপায় ক্ষমা করে দেন। কুফর ও শিরকের গোনাহ্ ঈমানের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ
عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ
وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝ وَيَرَى الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى
صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰي
رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝
اَفْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي
الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ
كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

(৩) কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ—অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ—সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মু'মিন ও সৎকর্ম-পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে? (৮) সে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (৯) তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্‌ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। আপনি বলে দিন, কেন (আসবে না)? আমার অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত পালনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। (তাঁর জ্ঞান এমন সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী যে,) তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে (বরং সবই তাঁর জ্ঞানে উপস্থিত) এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, না বৃহৎ—সমস্তই (আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে) সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুযে) আছে।

(কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত যদি আসেই, তবে কখন আসবে বলুন أَيَّانَ مُرْسَاهَا দুই. যেসব অংশ একত্র করে তাতে জীবন সঞ্চার করা হবে বলা হয় সেগুলোর তো নাম-নিশানাও থাকবে না। কাজেই একত্র করা হবে কিরূপে?

অদৃশ্য জ্ঞান সপ্রমাণ করার উপরোক্ত বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রথমে সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়জ্ঞান বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত। পয়গম্বরের এটা জানা না থাকলে জরুরী হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্ বলেন, قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী জ্ঞান সপ্রমাণ করার দ্বারা দ্বিতীয় সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ মানবদেহের সমুদয় অংশ পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও আমার জ্ঞানের অগোচরে আসবে না। আমি যখন ইচ্ছা একত্র করে নেব। আল্লাহ্ বলেন لِيَجْزِيَ الَّذِينَ এখন কিয়ামতের উদ্দেশ্য বর্ণিত হচ্ছে।) যাতে মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (উত্তম) প্রতিদান দেন। (সুতরাং) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও (জান্নাতে) সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে বানচাল করার চেষ্টা করে নবীকে পরাস্ত করার জন্য, (যদিও এ চেষ্টায় ব্যর্থও হয়) তাদের জন্য কঠোর মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (কোরআনের আয়াত বানচাল করার জন্য এ শাস্তি হওয়াই উচিত। কেননা কোরআন সত্য ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এরূপ সত্যকে বানচাল করা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে মিথ্যা বলার শামিল। দ্বিতীয়ত কোরআন সৎপথ প্রদর্শন করে। যে একে অমান্য করবে, সে ইচ্ছাপূর্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে। সে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সন্ধান পাবে না। এটাই ছিল মুক্তির পথ। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুক্তির পথ বর্জন করার কারণে শাস্তি হওয়া অন্যায় নয়। কোরআন সত্য ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রমাণ করার এক সহজ পদ্ধতি এই যে) যারা (ঐশী গ্রন্থসমূহের) জ্ঞান প্রাপ্ত, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র (সত্তাটির) পথপ্রদর্শন করে। (এ সম্পর্কে সূরা শোয়ারায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামতের খবর সম্বলিত হওয়ার কারণে কোরআনের সত্যতাকেই এ স্থলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুবা ঈমানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। সুতরাং সার কথা হল এই যে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও শাস্তি হবে। অতপর আবার কিয়ামত সপ্রমাণ করা হয়েছে।) কাফিররা (পরস্পরে) বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর) খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও (কিয়ামতের দিন) তোমরা নতুন সৃজিত হবে। সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (ইচ্ছাপূর্বক) মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ। (ফলে ইচ্ছা ছাড়াই মিথ্যা বলছে। কেননা, এটা অসম্ভব বিধায় এ সম্পর্কিত খবর মিথ্যা। আল্লাহ্ বলেন, আমার নবী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ কিছুই নয়) বরং যারা পরকালে অবিশ্বাসী তারাই আযাব ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত। এই পথভ্রষ্টতার নগদ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব এই যে, শাস্তি ভোগ করতে হবে। মূর্খেরা বিক্ষিপ্ত জড় অংশসমূহ একত্র ও পুনরুজ্জীবিত করাকে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত মনে করে। (জিজ্ঞাসা করি,) তারা কি (কুদরতের প্রমাণাদির

মধ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, যা তাদের সামনে ও পশ্চাতে বিদ্যমান আছে (যে, তারা যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই এগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। এসব বিশালকায় বস্তু যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ক্ষুদ্রকায় বস্তু পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? আল্লাহ্ বলেন ঃ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

সত্যের প্রমাণাদি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে তারা তাৎক্ষণিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। শাস্তিও এমন যে, আল্লাহ্র কুদরতের প্রমাণ এবং তাদের জন্য মহা নিয়ামত এই আকাশ ও পৃথিবীকেই তাদের শাস্তির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিয়ামত অস্বীকার করা হয়, তাকেই আযাবে রূপান্তরিত করে দিলে পরিতাপ বেশি হয়। আমি এ শাস্তি দিতেও সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোন খণ্ড পতিত করব। (কিন্তু রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। মোটকথা তাদের উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা। কেননা,) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে (কিন্তু) সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্ অভিমুখী (এবং সত্যান্বেষী। অর্থাৎ প্রমাণ তো যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অন্বেষণ নেই। তাই তারা বঞ্চিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبِّ—এটা عَالِمِ الْغَيْبِ শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফিরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্র করা, অতপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরূপে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোন্ বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোন কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারও এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণা-সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

لَتَأْتِيَنَّكُمْ—এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিযিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে أُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا—অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে।

مُعَاجِزِينَ—অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ—অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ—এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ

এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের ছলে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান নেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফিররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ—শব্দটি مزق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা।

كل ممزق -এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতপর কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ—উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনেশুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উম্মাদ, যার কথার কোন সঠিক ভিত্তি থাকে না।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল-কায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আযাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا
لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا
شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ
لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ
اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا

قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا
فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

(১০) আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বত-মালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলে-ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পা-দন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করার। (১৩) তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সেমতে আমি পর্বত-মালাকে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা! দাউদের সাথে বার বার পবিত্রতা ঘোষণা কর (অর্থাৎ সে যখন যিকিরে লিপ্ত হয়, তোমরাও তার সাথে যিকির কর) এবং (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (আদেশ দিয়েছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً

সম্ভবত এর রহস্য এই ছিল যে, তিনি যিকিরে স্ফূর্তি অনুভব করবেন অথবা তাঁর মু'জিযা ফুটে উঠবে। পক্ষীকুলের এই তসবীহ্ খুব সম্ভব শ্রোতাদের বোধগম্য ছিল। নতুবা অবোধগম্য তসবীহ তো তারা করেই থাকে। এতে দউদ (আ)-এর সাথে করার

কোন বিশেষত্ব নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ---আরেক নিয়ামত এই দিয়েছিলাম যে,) আমি তাঁর জন্য লৌহকে (মোমের মত) নরম করেছিলাম (এবং আদেশ দিয়েছিলাম যে,) তুমি এই লোহার প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং (আমার দেওয়া এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমরা সকলেই [অর্থাৎ দাউদ (আ) ও তাঁর লোকজন] সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (তাই পূর্ণ গুরুত্বসহকারে আদেশ পালন কর।) আর আমি বায়ুকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। [অর্থাৎ বায়ু সোলায়মান (আ)-কে এতটুকু দূরত্বে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِأَمْرِهٖ ---আরেক নিয়ামত এই দিয়ে ছিলাম যে,] আমি তাঁর জন্য গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। (অর্থাৎ তামাকে খনিতে তরল করে দিয়েছিলাম, যাতে তদ্দ্বারা কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করা সহজ হয়। দ্রব্য তৈরির পর সেই গলিত তামা জমাট হয়ে যেত। এটাও ছিল একটা মু'জিযা। আরেক নিয়ামত এই ছিল যে, আমি জিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম। সেমতে) কতক জিন তাঁর সামনে (নানা রকম) কাজকর্ম করত, তাঁর পালনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর সাথে জিনদেরকে আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে কেউ (সোলা-য়মানের আনুগত্য সম্পর্কিত) আমার আদেশ লংঘন করবে, [অধীন করে দেওয়ার কারণে সোলায়মান (আ) তাদেরকে বেগারদের ন্যায় বাধ্যতামূলক কাজে লাগাতে পারতেন]। আমি তাকে (পরকালে) জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব। (এ থেকে একথাও জানা গেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করবে, সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। অতপর জিনদের আদিষ্ট কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ) জিনরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া এসব নিয়ামতের বিনিময়ে) হে দাউদ পরিবার, [অর্থাৎ সোলায়মান (আ) ও তাঁর লোকজন,] তোমরা সকলেই (এসব নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সৎকর্ম সম্পাদন কর। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। [তাই এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা বহু লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। সুতরাং এ বাক্যে কৃতজ্ঞতা ও সৎকর্মে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। সারা জীবন সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিনরা এভাবে কাজ করে গেল।] অতপর যখন আমি তাঁর মৃত্যু ঘটালাম (অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল

করলেন,) তখন [মৃত্যু এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরই পেল না। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় সোলায়মান (আ) দু'হাতে লাঠি ধরে লাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এমনিভাবে সারা বছর উপবিষ্ট রইলেন। জিনেরা তাঁকে উপবিষ্ট দেখে জীবিত মনে করতে থাকল। কাছে যেয়ে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারও ছিল না। সন্দেহেরও কোন কারণ ছিল না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে যথারীতি কাজ করে গেল] এবং ঘুণপোকা ব্যতীত কেউ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করল না। সে সোলায়মান (আ)-এর লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। [অবশেষে লাঠি ঘুণে খাওয়ার কারণে ভেঙে পড়ে গেল। লাঠি পড়ে যাওয়ায় সোলায়মান (আ)-এর অসার দেহও মাটিতে পড়ে গেল।] যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন (এবং ঘুণে খাওয়ার হিসাব করে জানা গেল যে, এক বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে) তখন জিনেরা (তাদের অদৃশ্য জ্ঞান দাবির স্বরূপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে (সারা বছর) এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না (অর্থাৎ হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে। এতে গোলামির কারণে লাঞ্ছনাও ছিল এবং কষ্টের কারণে বিপদও ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একত্র করে জীবিত করাকে অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হত ; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, বায়ুকে আজ্ঞাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মত করে দেওয়া।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا—অর্থাৎ দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فَضْل--এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কতক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্র যিকির অথবা যবুর তিলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

أَوِّبِي—يَا جِبَالُ أَوِّبِي শব্দটি تَأْوِيب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বারবার করা। আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ) আল্লাহ্র যিকির ও তসবীহ্ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আবৃত্তি কর। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) এ শব্দের তফসীর তাই করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্ পাঠ সেই সাধারণ তসবীহ্ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ—অর্থাৎ জগতের সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস তসবীহ্ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ্ হযরত দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিযার মর্যাদা রাখে। তাই এ তসবীহ্ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মু'জিযা হত না।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কোরআন পাক একে দাউদ (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফিরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ—এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের مفعول হয়ে منصوب হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তসবীহ্ পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً —অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তসবীহ্ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ—অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'জিযা-রূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোন কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে ঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। تَقْدِيرٌ শব্দটি قَدَّرَ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سَرْد-এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ—এর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত—সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফযীলত ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ——অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপ-ভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত 'আত্তিব্বুন্নবভী' নামক কিতাবে বর্ণিত

আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবী মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ্ঃ আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হত না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

দাউদ (আ)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্যঃ তফসীরে ইবনে-কাসীরে বর্ণিত আছে---হযরত দাউদ (আ) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মত নরম করে দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাস'আলাঃ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা

জায়েয। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনৈশ্বর্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল ; আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল। فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর দাউদ (আ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিয়ে থাকেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান। তাঁরা বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

ফায়েদা ঃ হযরত দাউদ (আ) নিজের এই কর্ম নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হযরত ইমাম মালিকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ—দাউদ (আ)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সোলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানী করে দিলেন। কেননা তাঁর শরীয়তে গরু-মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানীও জায়েয ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কোরবানী করার কারণে নিজের ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সুলায়মান (আ) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবানী করেছিলেন। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরও উত্তম বস্তু দান করলেন। (কুরতুবী)

غدو শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رواح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌঁছে আহার করতেন। অতপর সেখান থেকে যোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌঁছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়।—(ইবনে কাসীর)

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ—অর্থাৎ আমি সোলায়মান (আ)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এর পাত্র ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قطر শব্দের অর্থ গলিত তামা। —(কুরতুবী)

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ—এ বাক্যটিও উহ্য سخرنا ক্রিয়া-পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার

ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-নওকরের মত অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ ঃ এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও ওযীফার কোন প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুল মুনীর' তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হোরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আনসারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলিমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরীয়তে জায়েয কি-না, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলিম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহকামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্র আদেশক্রমে মু'জিযারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে সোলায়মান (আ)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলী খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবূ নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সোলায়মান (আ)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরী কলেমা ও যাদুকে কাজে লাগায়। কাফির জিন ও শয়তান এগুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এতটুকুই যে, তারা আলিমদের কুফরী ও শিরকী আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলিমরা কোরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফির জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্র আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোন শরীয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সার কথা এই যে, যদি কোন ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহ্‌র মেহের-বাণীতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন সোলায়মান (আ) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু'যিজা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরী বাক্য অথবা কুফরী কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গোনাহ্‌ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গোনাহ্‌ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকাহবিদগণ নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গোনাহ্‌ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আ-কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলীর ব্যবহারকেও নাজায়েয লেখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহ্‌র নামসমূহ অথবা কোরআনী আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মত গোনাহ্‌ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েয যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই—উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরূপ আমল করা নাজায়েয। কারণ, এতে استرقاق حر অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরী হয়ে পড়ে, যা হারাম।

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ—অর্থাৎ কোন জিন যদি সোলায়মান (আ)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। (কুরতুবী) এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃজিত। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অগ্নি। কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ—এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা

সোলায়মান (আ) জিনদের দ্বারা করাতেন। محاريب শব্দটি محراب--এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও محراب বলা হয়। এ শব্দটি حرب থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে محراب বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই محراب বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই محاريب শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে محاريب بنى اسرائيل এবং ইসলাম যুগে محاريب صحابة বলে তাঁদের মসজিদ বোঝানো হত।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাযীদের প্রাচুর্য এবং মসজিদসমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সবকাতার নামাযীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরানিব ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাযীদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোন কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খিলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

মাস'আলা ঃ যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব স্বতন্ত্র স্থানের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাযীদের দিকে দণ্ডায়মান হওয়া ইমামের জন্য অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মকরূহ ও নাজায়েয। কোন কোন মসজিদের মেহরাব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট কাতার তাতে দাঁড়াতে পারে। এরূপ মেহরাবে মুক্তাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মকরূহ হবে না। কারণ, এতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে।

تَمَاثِيل শব্দটি تِمْثَال-এর বহুবচন। অর্থ চিত্র। ইবনে আরাবী আহকামুল কোরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে---প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার---এক. জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না ; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। দুই. হ্রাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সোলায়মান (আ)-এর জন্য উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমত تَمَاثِيل শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, সোলায়মান (আ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং প্রতিমা পূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার আগমন হতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আছে।

এমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিক্রয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই হারাম করা হয়েছে। চুরি হারাম করা হলে কারও গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ এমন কি, বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিনা হারাম করা হলে মাহরাম নয় এরূপ কারও দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোট-কথা শরীয়তে এর অসংখ্য নযীর বিদ্যমান রয়েছে।

একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জওয়াব ঃ বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে প্রচলিত চিত্রের ব্যবহার মূর্তিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্তু আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনা-বলীর তদন্তে সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে আজকাল চিত্রকে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এতে

মূর্তিপূজা ও উপাসনার কোন ধারণা-কল্পনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

জওয়াব এই যে, প্রথমত এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মূর্তিপূজার উপায় নয়। বর্তমানেও এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তাদের মহাপুরুষদের চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোন বিধান কোন কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তিপূজার উপায়; বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে এর নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য আরও কারণ বর্ণিত আছে। উদাহরণত চিত্র নির্মাণে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। مُصَوِّر (চিত্রনির্মাতা) আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয়। সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবস্তুর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে মিলে না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকৃতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পষ্ট ভিন্ন। এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ নয়। দর্শক মাত্র কোনরূপ চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে। এই আকার নির্মাণ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত কার সাধ্যে আছে? যে ব্যক্তি কোন প্রাণীমূর্তি অথবা রঙ ও তুলির সাহায্যে কোন প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন কার্যত দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও। আমি কেবল আকারই নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে তোমাদের নির্মিত আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও।

সহীহ্ হাদীসসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিত্র ও কুকুরকে ঘৃণা করে। যে ঘরে এগুলো থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া এ প্রবাদ বাক্যটিও মিথ্যা নয় যে, خانہ خالی را دیو می گیرد অর্থাৎ খালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে যায়। কোন গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সেখানে শয়তানের আড্ডা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের কুমন্ত্রণা থাকবে, এটাতো স্বাভাবিক।

কোন কোন হাদীসে আরও একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিত্র দুনিয়ার প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসজ্জা। বর্তমান যুগে চিত্র দ্বারা যেমন অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অশ্লীলতা এসব চিত্র থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোটকথা,

শরীয়ত কেবল এক কারণে নয়—অনেক কারণের দিকে লক্ষ্য করে প্রাণীচিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেসব কারণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তাতে শরীয়তের আইন পরিবর্তিত হতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون — অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতারা সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে।

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) চিত্র নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, كل مصور فى النار অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে।—(বুখারী, মুসলিম)

ফটো ও চিত্র ঃ কারও কারও এরূপ বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয়; বরং এটা প্রতিবিম্ব, যা আয়না, পানি ইত্যাদিতে ভেসে উঠে। সুতরাং আয়নায় নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েয, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েয। এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিম্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোন উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেয়া না হয়। যেমন, পানি ও আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব স্থায়ী নয়। আপনি সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিম্বও শেষ হয়ে যায়। যদি আয়নার উপরে কোন মসলা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে নেওয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে, যার নিষেধাজ্ঞা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

جِفَانٍ—শব্দটি جفنة—এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা, টব ইত্যাদি। جوابٍ শব্দটি جابية—এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قدور শব্দটি قدر—এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

راسيات স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তফসীরবিদ যাহ্হাক এ তফসীরই করেছেন। اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور — হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান ঃ কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামত দাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেওয়া নিয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন, নামায কৃতজ্ঞতা, রোযা কৃতজ্ঞতা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আল্লাহ্‌ভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ করার জন্য اشكرونى সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اعملوا شكرا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সেমতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আ)-এর জায়নামায কোন সময় নামাযী থেকে খালি থাকত না। (ইবনে-কাসীর)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন অতপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক-ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ফুযায়েল (র) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উক্তিগত অথবা কর্মগত শোকর তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, الان شكرتنى يا داود অর্থাৎ হে দাউদ! এখন তুমি আমার শোকর আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্‌সাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اعملوا آل داود شكرا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ

যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, সে তিনটি কাজ কি ? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন---জাস্‌সাস্‌)

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ---শোকরের আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মু'মিনগণকে শোকরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ—আয়াতে منسأة শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবী শব্দ। نساء শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে منسأة অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথ নির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা ঃ এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ) অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিন জাতি, বিহঙ্গকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর আদেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান (আ) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হত তিনি ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তাঁরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ